Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 136 – 145
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মীনাক্ষী সেনের ছোটোগল্পে ত্রিপুরার বাঙালি সংকট

গোবর্দ্ধন অধিকারী
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর
ইমেইল : gobardhan.adhikari@gmail.com

Keyword

Tripura, Son of the Soil, Bangali, Identity Crisis, Minakshi Sen.

Abstract

Minakshi Sen, a literature of Bengali Language had gone to Tripura, a state of India. There she noticed the life and the crisis of the local people, the son of the soil. They were mostly deprived by the Bengalee people, who are not the native of Tripura. From the present Bangladesh and West Bengal people had gone to Tripura, Assam for their jobs. These people stayed their year after year and once upon a time they decided to settle there permanently. These Bengalee community of Tripura, Assam or in other North-East states of India who had gone there from Bangladesh and West Bengal specially by depriving the native people occupy their land. Actually they occupy the tribal land of these states. Tribal people believed the Bengalee much for their culture and education. Even they had given shelter the Bangali migrant various times. But they were uprooted by the Bengalee from their own land.

The ground reality of Tripuri people or Assamese depicts in Bengali literature of Assam and Tripura. These scenario is different from Bengali literature of West Bengal and Bangladesh or which is called mainstream Bengali Literature. Like other Bengali writer Minakshi Sen deals with this topic in her writings, as she settled in Tripura from West Bengal. Minakshi's short story deals with the crisis of the native people, Tripuri who lost their land, lost their aboriginality. But another opposite version of this crisis is main target of this essay; Crisis of the Bengalee people of Tripura. Learned Bengalee of Tripura feels that their ancestors did unethical doings with the tribal of that region. Even the cultural hegemony of Bengalee deprived the tribal. Son of the soil of Tripura compelled to think that they are the 'other' in their homeland. So present day Bengalee people feel identity crisis. Minakshi's story deals with the crisis of Tripuri or the socio-economic problems of the tribal community. So in this essay we will discuss about the crisis of Bengalee people from humanitarian ground.

Discussion

১

মীনাক্ষী সেন (১৯৫৪-২০১৪) বাংলা ছোটোগল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র স্থানের দাবি রাখেন। ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল বসবাসের কারণে সেখানকার বাস্তব সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাই ত্রিপুরার মেয়েদের নিয়ে নানান সমস্যার গল্প উঠে আসে 'কয়েকটি মেয়েলি গল্প' গ্রন্থে। তাঁর 'জেলের ভেতর জেল' গ্রন্থটি জেল জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন বসবাসের সূত্রে তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়বস্তুতে ওই অঞ্চলের সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। সীমান্ত সমস্যা, উদ্‌বাস্তু, বাঙালি উদ্‌বাস্তু ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। অবশ্য অন্যান্য বিষয় নিয়েই তিনি লেখালেখি করেছেন। তবে তিনি সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখালেখিতেই সার্থক গল্পকার। আর ত্রিপুরার সমস্যাগুলি শুধুমাত্র ত্রিপুরার নয়, উঃ-পূঃ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও একই সমস্যা দেখা যায়। পেশাগতভাবে তিনি ত্রিপুরায় শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার রাজ্য মহিলা কমিশনের সম্পাদক পদেও ছিলেন।

উঃ-পূঃ ভারত বহুবিধ জাতি-উপজাতিতে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। অসাধারণ তার প্রাকৃতিক সম্ভার। বাঙালিরা বহুকাল আগে থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। এই অঞ্চলের রাজারা বাঙালিদের পছন্দ করতেন। ফলত বাঙালিদেরকে বসবাসের জমি দিয়ে মাণিক্য রাজারা নিয়ে যেতেন। যেমন ত্রিপুরার 'রাজমালা(১)' থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, রাজারা কীভাবে বাঙালিদের নিয়ে যেত -

"বঙ্গ উপনিবেশ
গৌড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর।
বঙ্গলোক কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার।।
পুনঃ দশ হস্তী দিল গৌড়েশ্বর তরে।
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে।।
পরয়ানা করি দিল বার বাঙ্গলাতে।
নবসেনা যতেক মিলানি করি দিতে।।
দশ হাজার ঘর বঙ্গ দিতে আজ্ঞা হোইল।
বঙ্গে আসি সেনা চারি হাজার পাইল।।
... ...
রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।
যশপুরে বসাইল পঞ্চশত পর।।
হীরাপুরে পঞ্চশত ঘর বৈসাইল।
এই মতে রাঙ্গামাটি নবসেনা গেল।।"[১]

এছাড়াও ব্রিটিশ আমলে উঃ-পূঃ ভারতের এই অঞ্চলে বাঙালিদের সমাগম আবার বাড়তে থাকে। কারণ ব্রিটিশরা প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষিত বাঙালিদেরকে নিয়ে যেত। এরা সেখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বংশপরম্পরায় বসবাস শুরু করে। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন। এই রাজ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল সুসম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'(১৮৯০) নাটক তো ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটেই লেখা। আসলে ত্রিপুরা থেকে অসম সর্বত্রই সেকালের রাজা এবং সাধারণ মানুষ শিক্ষিত বাঙালিদের এবং তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতেন এবং তাদেরকে পছন্দ করতেন। রাজপরিবারের প্রশাসনিক ও অন্যান্য নানান কাজে বহু বাঙালি কর্মচারি নিযুক্ত থাকত। এরপরে দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই রাজ্যগুলিকে। বিশেষত এর ফল ভুগতে হয় ত্রিপুরা ও অসমকে। এই দুই রাজ্যের সীমানা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় পাকিস্তান ছেড়ে আসা বাঙালিরা উঃ-পূঃ ভারতের এই রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে। আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার

সময় উদ্‌বাস্তু বাঙালি এই রাজ্যগুলিতে ভিড় জমায়। ক্রমাগত উদ্‌বাস্তু মানুষের আগমনে রাজ্যগুলির প্রশাসনিক কর্তারা বাঙালিদের জমি দিয়ে বসবাস করতে দেন। কিন্তু এই ভালো কাজের বিপরীতে ছিল অমানবিক কাজ। এই অঞ্চলের উপজাতি শ্রেণির মানুষ বা ভূমিপুত্রদের বাধ্য করা হয় তাদের জায়গা-জমি ছেড়ে দিতে। তাদের প্রাণের স্থান তাদের জীবিকার সংস্থানকারী বনভূমিকে কেটে বসতি গড়া হয়। ফলত ভূমিপুত্ররা নিজভূমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ধূর্ত বাঙালিরা এই অঞ্চলের সরল অশিক্ষিত পাহাড়ি মানুষগুলোকে নানাভাবে প্রতারিত ক'রে পুনরায় জমি কেড়ে নেয়। যে মানুষগুলো শরণার্থীদের সাহায্য করেছিল, নিজেদের জমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিল তাদের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। সুতরাং উল্টো দিক থেকে পালটা মারটাও খেতে হল।

বাঙালিরা শুধু এই অঞ্চলের জায়গা-জমি দখল করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের নিয়মে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিকে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। বাঙালিরা শিক্ষিত হওয়ায় (ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুফল প্রথম বাঙালিরাই সফল ভাবে ও সদর্থক অর্থে গ্রহণ করেছিল) উঃ-পূঃ-এর রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক হিসেবে তারাই নিযুক্ত হোত। নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে কেউ হারাতে চায় না। আসলে এটাও এক ধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের (cultural hegemony) রাজনীতি। বহিরাগতরা যাতে এই অঞ্চলে মানুষের স্বাতন্ত্র্যতা নষ্ট না করে সেজন্য সংবিধানে ষষ্ঠ তপশিলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় -

> "ষষ্ঠ তপশিলটি উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের প্রতি প্রযোজ্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জেলাভিত্তিক ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, জমি, অরণ্য আর জলপথের ওপর স্থানীয় অধিকার রক্ষা, রাজ্য সরকারকে স্থানীয় পরিষদের সঙ্গে আয়কর-রাজস্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার নির্দেশ দান, প্রভৃতি ব্যাপারে এই তপশিল আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল। বিশেষ করে এই শেষোক্ত সুবিধাটি ভারতের অন্য কোথাওই দেওয়া হয়নি।"[২]

সংবিধানে এইসব রক্ষাকবচ দিয়ে বহিরাগত বা 'দিকু'দের আক্রমণ থেকে এদের রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলির চরিত্র সমগ্র ভারতের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে খাদ্যাভ্যাস – পোশাক – জাতি - উপজাতি; সব মিলিয়ে এই অঞ্চল স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ। তাই স্বাধীনতার পরে পরেই এরা অনেকেই আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করেছিল। কারণ ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ নেই। ঝাড়খন্ড পার্টির জয়পাল সিংহ নাগা আন্দোলনের নেতা ফিজো-কে সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিবর্তে উপজাতীয় রাজ্য গঠনের কথা বললে তিনি বলেন -

> "নাগারা মঙ্গোল জাতিভুক্ত, তাই ভারতের জনগণের প্রতি তাদের কোনও জাতিবর্ণগত টান নেই।"[৩]

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মানুষরা আর্য সম্প্রদায় ভুক্ত। এই রাজ্যসমূহে বাঙালিদের বসবাস বহুকাল ধরে। নির্দিষ্ট কোন সময় থেকে এবং কোথা থেকে বাঙালিদের এই অঞ্চলে আগমন তার নির্দিষ্ট তথ্য ঐতিহাসিকেরও অজ্ঞাত।

উঃ-পূঃ ভারতের এই রাজ্যগুলির অধিকাংশই উপজাতি অধ্যুষিত। ব্রিটিশপূর্ব সময়কাল থেকেই উঃ-পূঃ ভারতে বাঙালিদের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস ছিল। ব্রিটিশরা পর্যায়ক্রমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেই সময় থেকে ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের বসবাস বাড়তে থাকে। মূলত প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এইসব অঞ্চলে শিক্ষিত বাঙালিদের ব্রিটিশ সরকার নিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে নানা সময়ে কৃষিকাজের জন্য পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালি মুসলমান কৃষকরা এই অঞ্চলে পাড়ি দেয়। ফলত বাঙালি এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে থাকে। বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল অসম - ত্রিপুরা সহ অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও। একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, অসমের প্রেক্ষাপটে -

> "বিশেষ ভাষার প্রসার ও সমাদর এতটাই হয়েছিল যে, ১৮৩৬-এ অসমের স্কুলগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার প্রচলন হওয়ার অন্তত আট বছর আগে, হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলা ভাষাতেই 'আসাম বুরুঞ্জি' লেখাটা যথার্থ মনে করেছিলেন।"[৪]

বাংলা ভাষা সেসময় এতটাই কদর পেয়েছিল যে, এই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরাও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা পর্যন্ত করেছেন।

জাতি-উপজাতিগত সমস্যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও সমানভাবে বিদ্যমান। উপরন্তু নতুন নতুন সমস্যা এইসব সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। জাতিগত দাঙ্গার তুলনায় উগ্রপন্থী সমস্যা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রায়শই অগ্নিগর্ভ করে তোলে। উগ্রপন্থী দলগুলির চরিত্র জন্মমুহূর্তে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মতো ছিল না। তাদের আঁতুড়ঘরে স্বপ্ন ছিল উচ্চ আদর্শের। কিন্তু নানারূপ স্বার্থের সংঘাতে তারা তাদের প্রকৃত চরিত্র হারিয়ে ধ্বংসাত্মক উপাদানে পরিণত হয়ে যায়। বৈরি দলগুলি সীমান্তে রীতিমতো সমান্তরাল প্রশাসন চালায়। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না। এর পরে আছে উগ্রপন্থী নিধন করতে আসা সৈন্য বিভাগ ও পুলিশ-প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আছে বিশেষ আইনি ব্যবস্থা, যা সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে। ইরম শর্মিলা চানুর অনশন-ধর্মঘট আন্দোলনের কথা তো আজ আমাদের সবারই জানা। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার একটি আইন পাশ করে Armed Forces (Special Powers) Act, 1958। এই আইন উ:-পূ: ভারতের রাজ্যগুলিতে চালু আছে। এর ফলে যেকোনো ব্যক্তিকে সন্দেহের ফলে গ্রেপ্তার করা যায়। আর নারীর শরীর সবকিছুতেই সহজলভ্য ও সহজ ভোগের বস্তু। রক্ষক ও ভক্ষক সকলেই নাম বদলে আসলে একই কাজে লিপ্ত থাকে।

সীমান্তবর্তী এই রাজ্যগুলিতে আছে শরণার্থী সমস্যা। যারা বর্তমানে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যা দেশভাগের ফলাফল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সমস্যা এই ২০২৩ সালেও মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। বিশেষত আসাম-ত্রিপুরা এই দুই রাজ্যে এই সমস্যা প্রকট। বিদেশি বিতাড়নের নাম করে একদল মানুষকে তারই প্রতিবেশি ভিটে থেকে উচ্ছেদ করার নোংরা খেলায় মেতে ওঠে। কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই অঞ্চলের মানুষের নতুন করে ভাবনা শুরু হয়। নতুন সরকার বিদেশি বিতাড়ন-এর নামে নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরি করে কিনা। কারণ সরকারি একটি ঘোষণাতেই তাদেরকে আবার হয়ত নিজের দেশ খুঁজতে বের হতে হবে। যেটাকে সে নিজের দেশ মনে করে এসেছে কলমের এক খোঁচায় সেটাই নাকচ হয়ে যায়। আর এই শরণার্থী সমস্যা বা বিদেশি বিতাড়ন সমস্যা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সমস্যা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন পকেটে এই সমস্যা ভয়ঙ্করভাবে আছে।

২

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করতে চাই মীনাক্ষী সেনের গল্পগুলি। মীনাক্ষী সেন অধিক পরিচিত তাঁর 'জেলের ভেতর জেল' গ্রন্থের জন্য। বামপন্থী মানসিকতায় দীক্ষিত ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে অল্প বয়সে। উঃ-পূঃ ভারতের অনেক লেখকই উল্লিখিত বিষয় অবলম্বন করে আখ্যানের বয়ন নির্মাণ করেছেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, দেবব্রত দেব, শঙ্খশুভ্র দেববর্মন, শেখর দাশ, দেবীপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ লেখকেরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচিত সমস্যাগুলিকে নিয়ে কাহিনি বুনেছেন। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে কেবলমাত্র মীনাক্ষী সেন-এর ছোটোগল্প নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্যই যেসব গল্পে আমাদের উদ্দিষ্ট সমস্যাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলিকেই নির্বাচিত করা হবে।

বিশেষত বাঙালিরা উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে উপেক্ষিত ও সন্দেহের অধীন। তারা তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক লড়াই করে চলেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় এডওয়ার্ড সাইদ-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'Out of Place' বা 'ঠাঁই নাড়া'র কথা। যেখানে সাইদ নিজে এরকম অস্তিত্ব সংকটে ভুগতেন। গল্পকার মীনাক্ষী সেন-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেবেশ রায় যথার্থই বলেছেন -

> "এত সহজে এতটা নিষ্ঠুরতার গল্প মীনাক্ষী লেখেন যেন তিনি এক নিরস্ত্র শ্বাসহীনতার ভিতর আমাদের টেনে নিয়ে যান।"[৫]

তাঁর 'নিষ্ঠুরতা'র উপাদান সম্পূর্ণ বাস্তব থেকে নেওয়া। তাঁর লেখালেখির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু যতটুকু লিখেছেন সেখানে স্থান পেয়েছে সমাজকেন্দ্রিক গভীর সমস্যা। নিজেই নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন-

> "আমি নিজের লেখার অন্তর্বস্তুতে বিশ্বাসী, বিশ্বাসী সময়ে। এর অবলম্বনে আপনিই গড়ে ওঠে আমার লেখার ধরন, তার ভাষা। যা লিখতে চাইছি তা লেখা হল কি না, সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে আমার মনোযোগ।"[৬]

তাঁর দেখা সময়কে তিনি গল্পে স্থান দিতে চেয়েছেন। দীর্ঘদিন ত্রিপুরায় বসবাসের ফলে সেখানকার জনজীবনকে কাছ থেকে দেখেছেন। আর সেই দেখাই তাঁকে গল্প লেখায় প্রণোদিত করেছে। সমাজ-রাজনীতি বিষয়ে সচেতন একজন লেখকের কলমে আমরা যা প্রত্যাশা করি মীনাক্ষী সেন আমাদের তাই-ই দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

মীনাক্ষী সেন দেশ-কাল সম্পর্কে কিছু বলার জন্যই কলম ধরেন। বিশেষত মেয়েদের দুরবস্থা নিয়ে তাঁর লেখাগুলি আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। 'স্বদেশ বিদেশ' গল্পে তিনি এরকমই এক মেয়ের কথা বলেছেন। গল্পের শুরু হচ্ছে মেয়েটির জেলে বন্দি থাকাকালীন। তার দোষ সে এই ভারতে অনধিকার প্রবেশকারিণী। তার জন্ম বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে। তারপর থেকে মা মরা মেয়েটি ভারতে এসে এক মাসির কাছে মানুষ হয়। আসলে পুত্রহীনা মাসি মা মরা মেয়েটিকে মানুষ করে নিজের মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি মাসির অমতে মকবুলকে বিয়ে করে ফেলে। এখানেই যত সমস্যা। মাসির ক্ষোভে ইন্ধন যোগায় মাসির এক ভাই হারুনমামু। হারুনমামুর নির্দেশে থানায় অভিযোগ করা হয় মেয়েটি বাংলাদেশি। এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছে। যে জেলে মেয়েটি বন্দি আছে তা কৈলাসহর-এ। যা ত্রিপুরার উনাকোটি জেলায়। এটি ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বরাবর। ফলত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এখানে প্রায়ই ঘটে থাকে। তাই চার মাসের গর্ভবতী মেয়েটাকে শাস্তি দিতে বাংলাদেশি বলে অভিযুক্ত করতে পারে। অনুপ্রবেশের সত্যিকারের সমস্যাটাকে মানুষ যে এভাবেও ব্যবহার করতে পারে তা বিস্ময়কর। তবে এ দুনিয়ায় ভাই সবই হয়। সব সত্যি। জেলের ওয়ার্ডার মেয়েটির মানসিকতা পাঠকের কাছে তুলে ধরে মীনাক্ষী সেন আমাদেরই আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দেন। ওয়ার্ডার প্রথমে মেয়েটিকে পুশব্যাক করা হবে শুনে দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে মেয়েটির থেকে আলাদা করতে তার মনে আসে অন্যযুক্তি-

> "আসলে আমরা তো হিন্দু। ইন্ডিয়া আমাদের দেশ। ...তারা তো শেখ। তাদের দেশ পাকিস্তান, নয় বাংলা তাই হাকিম তারে থাকবার অ্যালাউ দিচ্ছে না এই দেশে।"[৭]

কিন্তু ভারত তো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষই স্বাগত। আসলে উঃ-পূ ভারতের একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা বাঙালি অনুপ্রবেশ। ভূমিপুত্র বলে যারা নিজেদের দাবি করে তারাই তো বাঙালিদের নানা সমস্যায় ফেলে। কিন্তু বর্তমান গল্পে দেখা গেল ভূমিপুত্ররা নয়, বাঙালিরাই বাঙালিদের 'পুশ ব্যাক' নামক সেই পাশবিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শুধুমাত্র বাঙালি নয় মাতৃসম মাসিই মেয়েটিকে পুশব্যাকের শিকার হতে বাধ্য করেছে। নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে দুর্বলকে কেউ ছেড়ে দেয় না। 'স্বদেশ বিদেশ' গল্পটিই সম্ভবত ২০০৪ সালে 'মীনাক্ষী সেন-এর ছোটগল্প' গ্রন্থে 'পুশব্যাক' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল। গল্পদুটির প্লট এবং বক্তব্য বিষয় এক। আমাদের মনে হয় 'পুশব্যাক' গল্পটিই পরবর্তীকালে লেখিকা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ২০০৭ সালে 'কয়েকটি মেয়েলি গল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'জগৎ জননী' গল্পে লেখিকা তুলে ধরেছেন সীমান্তপারের এক বাস্তব সমস্যা। পদ্মলতা বাংলা দেশের মেয়ে হয়েও বিয়ে হয় ত্রিপুরায়। অর্থাৎ ইন্ডিয়ায়। ইন্ডিয়া মানে সব প্রাপ্তির দেশ। অনেক সুযোগের দেশ। এই স্বপ্ন পদ্মর বাবা-মা দেখেছিল। তাই স্কুল মাস্টার গোপালের সঙ্গে আগুপিছু না ভেবেই বিয়ে দেয়। কিন্তু গোপাল বা তার বাবার কাছে মেয়ের গুরুত্ব শুধুমাত্র শরীরে। পদ্ম প্রতিবাদ করলে ডিভোর্সের কাগজ দেখায়। পদ্ম বাংলাদেশের নাগরিক। তাই থানার দারোগা তার স্বামীর বিরুদ্ধে ৪৯৮এ ধারায় কেস নিতে চায় না। কারণ এতে পদ্মই বিপদে পড়বে। কারণ ত্রিপুরা তার শ্বশুর বাড়ি হলেও সে এদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। আইনের চোখে সে অপরাধী। দীর্ঘদিন বাপের বাড়ি বাংলাদেশে থাকার পর পদ্ম আবার শ্বশুর বাড়ি ইন্ডিয়ায় আসলে লেখকের বাচনে -

> "সেই একশ টাকার বিনিময়ে সীমান্ত পারাপার। বিনা পাসপোর্ট, বিনা ভিসা, বাংলাদেশের নাগরিক, ত্রিপুরার বউ পদ্ম ...।"[৮]

এভাবেই টাকার বিনিময়ে দাললরা সীমানা পারাপার করায়। প্রয়োজন হলে এদেরকেই আবার বিএসএফ বা বিডিআর ধরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। এ তো গেল আইনের কথা। কিন্তু পদ্মর মতো মেয়েদের কী চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় এই কাঁটাতার! গল্পের একেবারে শেষে পদ্মর ভাবনা -

> "...এত বড় এই পৃথিবীতে দেশ বিদেশ স্বদেশের বাইরে এক টুকরো কোনও জমিতে সে আর তার সন্তানরা বৈধ নাগরিকের অধিকার নিয়ে পা রাখতে পারবে কিনা, দুই সন্তানকে কোনও বৈধ জীবন মা হয়ে সে দিতে পারবে কিনা- তার সন্ধানে দেশহীন পদ্ম হেঁটে যাচ্ছিল।"[৯]

এই গল্পগ্রন্থের নাম সার্থক। দেশ বিভাগ, উদবাস্তু, বাঙালি সমস্যা ইত্যাদি মেয়েদের জীবনে কীভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে তার সুন্দর ও নিখুঁত বর্ণনা এই বইয়ের গল্পগুলিতে আছে।

'পরিত্রাণ' গল্পে আছে বৈরী দলের মমতার উপরে অত্যাচারের ঘটনা। উঃ-পূ; ভারতে বৈরী দলগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায়শই সমান্তরাল প্রশাসন চালায়। সাধারণ মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করে এদের মর্জির ওপর। আসলে বৈরী দলগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্ম স্বাধীনতার লড়াই করার জন্য। যা পরবর্তীকালে পরিণত হয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে। প্রায় ১৯৪৭ সাল থেকে জাপু ফিজোর নেতৃত্বে নাগারা অস্ত্রসহ লড়াইতে নামে। ১৯৫৪ সালে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠনের মনোভাব ছিল-

> " 'অবাঞ্ছিত ভারতীয়দের' সম্পর্কে ঘৃণার তীব্রতা বহুগুণে বেড়ে যায় আর তারই পরিণামে ঘটে বিদ্রোহ'। উগ্রপন্থীরা এন এন সি-র নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেয়; আবেদন নিবেদন আর বিক্ষোভ জানানোর পথ পরিত্যাগ করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলে।"[১০]

শুধুমাত্র নাগারা বা জাপু ফিজোই একাজ করেননি, উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে এরূপ ঘটনা প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটেছে। সেইসঙ্গে এদেরকে ভারতের প্রতিবেশী শত্রুদেশগুলি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। স্বাধীনতার লড়াই এদের নিজেদের অজান্তেই একসময় খুন-জখম-লুঠপাট-নারী ধর্ষণে পরিণত হয়। 'পরিত্রাণ' গল্পে মমতাকেও ধর্ষণের জন্য ওরা তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু মমতা -

> "না গো, করতে পারে নাই, কিছু করতে পারে নাই- পা দুইটা এমনে আটকাইয়াছি- একেবারে বন্ধ।"[১১]

মমতার এই কাতরোক্তি ঠিক বিপরীত একটি দৃশ্যের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সাদাত হাসান মান্টোর 'খোল দো' গল্পে মেয়েটিকে ডাক্তার জানালা খুলে দিতে বললে মেয়েটি পাজামার দড়ি খুলে প্যান্টটা নামিয়ে দিয়েছিল। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই কিন্তু নারী অত্যাচারের শিকার। কারণ -

> "... –যেন মমতার শরীর দখল করার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে জয়পরাজয়, ঠিক হবে কে ভূমিপুত্র আর কে নয়, এই টিলা কার, ওই লুঙ্গা, ওই ছড়া শীর্ণ, ওর কে মালিক।"[১২]

আসলে নারীকে ভোগ করার মধ্য দিয়ে এরা ঠিক করে নেয় এদের জয়-পরাজয়। বিশ্বের ইতিহাসে সর্বত্রই একই দৃশ্য। যে মমতাকে অত্যাচারের শিকার হতে হয় তার বয়স মাত্র ষোলো।

'বনজঙ্গলের বাইরে' গল্পে আছে নীরব নামে এক পাহাড়ি অর্থাৎ ত্রিপুরী ছেলের সঙ্গে সমতলের এক অসহায় বালিকার মানবিক সম্পর্কের কাহিনি। বালিকাটি মামার বাড়িতে অত্যাচারের শিকার। তাই পালাতে চায় দিদির বাড়ি। কিন্তু কিছুই জানে না, চেনে না। নীরব দিন আনা দিন খাওয়া অনাথ পাহাড়ি। বালিকা তার কাছে মা-বাবার মৃত্যুর কথা বলে। উগ্রপন্থীরা হত্যা করেছে তার মা-বাবাকে। নীরব ভয় পায়। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণাই হয়ে গেছে পাহাড়ি মানেই উগ্রপন্থী। নীরবের 'মঙ্গোলীয় সরল মুখভঙ্গি' বালিকাটিকে তার পরিচয় করিয়ে দেয় যে সে পাহাড়ি। কিন্তু বালিকা সত্যই বালিকা। সে বাইরের জগতের এই পারস্পরিক বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের খবর রাখে না। তাই নীরবের ওপর সে ভরসা করে দিদির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আসলে কিছু মানুষের নিজের স্বার্থেই উগ্রপন্থী ধারণাটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ এখন এটা স্বাধীনতার যুদ্ধের থেকেও অনেক বেশি লোভনীয় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। নীরবের মাকে মিলিটারির অত্যাচারে মরতে হয়েছে। এই নীরব প্রতিশোধস্পৃহায় উগ্রপন্থী দলে যোগ দিতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তাই পুলিশ-প্রশাসনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা উচিত। নাহলে এই সমস্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ইরম শর্মিলা চানুর প্রতিবাদের বিষয় তো এটাই। ভারতীয় সৈন্যরা উঃ-পূঃ-এ আইনের শাসন প্রচলন করতে গিয়ে কত মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন করেছে তার হিসেব নেই। অনর্থক সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। সাধারণ

মানুষ কিন্তু কোনরকম বিরোধে যেতে চায় না। কিন্তু সমতলের অর্থাৎ বাঙালিদের সঙ্গে পাহাড়ি সরল মানুষদের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়।

আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চাইছি বাঙালিরা উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে নানাভাবে হেনস্থার শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু এর পিছনে বাঙালিদের দোষ কম নয়। নানান ঐতিহাসিক কারণে বাঙালিরা উঃ-পূঃ ভারতের রাজ্যগুলিতে সমবেত হয়েছিল বা হয়েছে। আমরা এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই মূলত বলছি। কিন্তু এই একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি উঃ-পূঃ অন্যান্য রাজ্যের বাঙালিরাও হয়ে থাকে। আমাদের আলোচিত লেখিকা যেহেতু ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন থেকেছেন এবং ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটেই তাঁর গল্পদেহ সৃজিত হয়েছে তাই এখানে আলোচনায় ত্রিপুরার কথাই প্রাধান্য পাচ্ছে। যাইহোক বাঙালিদের বর্তমান বা নিকট অতীতে নানা উপদ্রবের শিকার হতে হয়েছে তাদেরই পূর্বপুরুষদের নানান অমানবিক কার্যকলাপের জন্য। এরকমই একটি বিষয় নিয়ে গল্প 'সাতকানি জমি'। আসলে পার্বত্য অঞ্চলের সহজ সরল মানুষের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বাঙালি মহাজনরা তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করেছে অনেক সময়। তাদেরকেও একসময় 'নিজভূমিতে ধীরে ধীরে পরবাসী' করেছিল বাঙালিরা। মহাজনরা ট্রাইবালদের কম টাকা ধার দিয়ে বেশি করে লিখে রাখত। কোনোদিনই তারা টাকা শোধ করত পারত না। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে তাদের জায়গা-জমি মহাজনের হয়ে যেত। এ ছিল সরল পাহাড়িদের ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির পরিণামে দেখা যায়-

> "The major changes in the demographic balance of Tripura was reflected in 1951 census when tribal population was recorded at 36.85% and the trend continued till 1981 census when tribal population reached its lowest limit of only 28.4%."[১৩]

এটা খুব সুখের খবর নয়, ভালো খবর নয়।

বুদ্ধ দেববর্মার বউ বলেন-

> "ওদের হাতে পয়সা ছিল, মনে জমির ভুগ। ওরা প্রথম ঠকিয়ে, দেনার দায়ে জড়িয়ে, মিথ্যে কাগজ বানিয়ে আমাদের জমি সব কেড়ে নিতে লাগল। আর ছিল দোকানদাররা। তারা পাঁচ টাকায় জিনিস দেয়, আমরা চলি বিশ্বাসে, খাতা কখনো দেখি না, তারা খাতায় লেখে বিশ টাকা। তারপর একদিন দেনার দায়ে জড়িয়ে ফেলে কেড়ে নেয় জমি, বসত ভিট্টা পর্যন্ত।"[১৪]

এই গল্পে বিশ্রামগঞ্জের জীবন ভৌমিক যে কিনা জীবন লস্কর হতে গিয়ে উগ্রপন্থীদের হাতে তার পরিবারের মৃত্যু ডেকে আনে। আইন অনুযায়ী ট্রাইবালদের জমি অন্যদের বিক্রি করা যায় না। বুদ্ধ দেববর্মাদের সাতকানি জমি জীবন ভৌমিক দখল করার জন্য অন্য এক ভাইকে লস্কর পদবি দিয়ে এস.টি. তালিকায় নাম তোলে। কারণ লস্কর ত্রিপুরার উপজাতিদেরও পদবি হয়। তাই জীবন ভৌমিক ভাই বাদল লস্করের নামে সাতকানি জমি করে নিতে চায়।

ইতিমধ্যে ট্রাইবালদের জমি নন্-ট্রাইবালদের হস্তান্তর করা যাবে না আইন পাশ হওয়ায় জীবন ভৌমিক নিজেই এস.টি. তালিকায় নাম তুলে নেয়। ওই সাতকানি জমি দখল করার জন্য। কিন্তু জীবন ভৌমিক যখন সীমানা পেরিয়ে ১৯৭২ সালে বিশ্রামগঞ্জে আসে তখন এই বুদ্ধ দেববর্মার মতো আদিবাসীরাই আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু জীবন ভৌমিক নয়, এরকম উদবাস্তুদের সবাইকেই নিজের প্রাণ দিয়ে এই পাহাড়ি মানুষেরা রক্ষা করেন। গ্র্যাজুয়েট মধ্যবয়সিনী প্রথম আসা বাঙালিদের কথা বলেন-

> "- প্রথম যে রিফিজিরা আসে, তারা আমাদের ঘরের লোকের মতো। পান-সুপারি-সিঁদুর বিক্রি করতে তারা বাংলা থেকে আসত আর সন্ধ্যাবাজারে জিনিস বিক্রি করে থেকে যেত আমাদেরই ঘরে। ওরা যখন রিফিউজি হয়ে এল, আমাদের গ্রামের মাঝখানে ওদের বসিয়েছিলাম আমরা।"[১৫]

যে পাহাড়িরা বাঙালিদের এইভাবে রক্ষা করেছিল তাদেরই জমি জীবন ভৌমিক কেড়ে নিয়ে নিজের নামে করতে মেতে ওঠে। সেই খবর লোকের মুখে মুখে পৌঁছে যায় উগ্রপন্থীদের কাছে। যারা কিনা স্বঘোষিত দেশ-জাতির রক্ষাকর্তা। ফলত উগ্রপন্থীদের রোষের মুখে জীবন ভৌমিকের পরিবার নিঃশেষ হয়ে যায়। বৃদ্ধ বুদ্ধ দেববর্মা উগ্রপন্থীদের এই কাজ সমর্থন করেন না। কিন্তু একের পাপে অন্যে মরে। বুদ্ধ দেববর্মার মত ত্রিপুরীরা আজ ধূর্ত বাঙালিদের চক্রান্তে কোনঠাসা। গভীর বিষাদের বিষয় যখন এইভাবে নিজভূমের বাসিন্দারাই সংখ্যালঘু হয়ে যায়। এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। তাদেরকে সংখ্যালঘু হতে বাধ্য করা হয়েছে। ত্রিপুরার বাঙালিদের পরিস্থিতি উঃ-পূঃ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায়

আলাদা। কারণ ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু বাঙালিদের চাপে অন্যান্যরা সঙ্কটে আছে। তাই অন্যদের কাছ থেকে পালটা মার খেতে হয় উগ্রপন্থীদের ছদ্মবেশে। যদিও বর্তমানে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা উগ্রপন্থীদের হঠকারী আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আছে। বামপন্থী সরকার আসার পর থেকে পরিস্থিতি কিয়দংশে স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু তা যদি ত্রিপুরার আদি জনজাতিদের কোনোভাবে বঞ্চিত করে করা হয় তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

আবার অন্যরকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। মীনাক্ষী সেন-এর 'পিছুটানা জলের নদী, জলের নিচের মানুষ ও আরও কিছু' গল্পে এক ভূমিপুত্রের মুখেই শোনা যায় বাঙালি-আদি জনজাতিদের সম্প্রীতিমূলক সম্পর্কের কথা। সমতলে কীভাবে চাষ করতে হয়, কীভাবে একই জমি থেকে বারবার ফসল তোলা যায় তা ভূমিপুত্রদের জানা ছিল না। তারা পাহাড়ের কোলে বংশপরম্পরায় ঝুম প্রথায় চাষ করে আসছে। কিন্তু রিফিউজি বাঙালিরা জানত একই জমি থেকে কীভাবে দু'বার-তিনবার ফসল তোলা যায়। আসলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা ছিল মূলত কৃষক। চাষ তাদের রক্তে। তারা যেখানেই গেছে একটু চাষের জমি চেয়েছে। যে উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন থেকে দণ্ডকারণে পাঠানো হয়েছিল তারা সেখানে গিয়েও রুক্ষ জমিতে ফসল ফলাতে শুরু করেছিল। চাষের জমিই তাদের প্রাণ। বড়মাঝি তাই বলে-

> "ওরা আমাদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেয়নি- আমাদের জমিতে বাগী খাটতো ওরা, কিন্তু ওদের হাতে যাদু ছিলো। সমতলের এই জমিকে ওরা আমাদের চেয়েও অনেক ভালো জানতো। ফসলে উপচে উঠেছিলো এই উপত্যকা।"[১৬]

সুতরাং বড়মাঝির মতো আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে উদ্‌বাস্তু বাঙালির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যা আমাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে। সুতরাং মীনাক্ষী সেন-এর গল্পগুলিতে শুধুমাত্র বাঙালিদের বঞ্চিত হওয়ার বা বাঙালি বিদ্বেষের কথা নেই। সেই সঙ্গে সম্প্রীতির কথাও আছে। আবার বিপরীত দিকে দেখা যায় ত্রিপুরারই অন্য আর এক স্বনামধন্য লেখক বিমল সিংহ তাঁর লেখালেখিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিয়েছেন উপজাতি-বাঙালি সম্প্রীতির কথা।

অসমে একসময় ওখানকার আদি জনজাতি অর্থাৎ ভূমিপুত্ররা শিক্ষিত হয় ও নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়। দীর্ঘদিন বাঙালিরা এই অঞ্চলে আধিপত্য করায় বাংলা ভাষা একসময় এই অঞ্চলে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা ভাষা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয় এবং সরকারি কাজকর্মও বাংলাভাষায় হয়। ভূমিপুত্রদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঙালিরা ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে, এই সন্দেহ তাদের মধ্যে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি করে। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ফিরে পেতে তারা নানারূপ আন্দোলন ও সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। এরাই পরবর্তীকালে নানা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অরিজিৎ চৌধুরীর *নাগরদোলা* (২০০৩) উপন্যাসে দেখা যায় এরকমই আলফা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। তাঁর *পু ঘোষ* (২০০৩) গল্পে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর চাকরিরত বাঙালি যুবকের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের গা শিউরে ওঠা বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার অসমের প্রেক্ষাপটে দেবীপ্রসাদ সিংহ-র 'ঘন্টা কার জন্যে বাজছে?' গল্পে কলিং বেল বেজে ওঠে। সোমেন রাত্রি দশটায় পাঁচজোড়া আগন্তুকের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে শোনে-

> "... আমরা কারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? ... –সংগঠনের কাজে আমাদের তিন হাজার টাকা দরকার। ডোনেশন। ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডারের সই করা রসিদ পেয়ে যাবেন"।[১৭]

তারপর থেকে শুরু হয় সোমেন ও তার স্ত্রী দীপিকার আতঙ্কে জীবন কাটানো। ঘন্টা কখন কার জন্য বাজবে কেউ জানে না। অরিজিৎ চৌধুরী 'পু ঘোষ' গল্পে যা ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে দেখিয়েছেন, দেবীপ্রসাদ সিংহ তা অসমের পটভূমিতে দেখিয়েছেন। কিন্তু আসল কথা হল ভয়টা আছে। এবং তা অসম থেকে ত্রিপুরা সর্বত্র।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এই অঞ্চলের জনজীবনে পরিবর্তন ঘটায়। পূর্ববাংলা থেকে প্রচুর বাঙালি উদ্‌বাস্তু উঃ-পূঃ ভারতের এই রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভিড় জমায়। ছিন্নমূল বাঙালি উদ্‌বাস্তুরা অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের উন্মুক্ত জায়গা দখল করে বসবাস করতে শুরু করে। সব থেকে বেশি অনুপ্রবেশ ঘটে পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা এবং অসমে। এখানকার আদি জনজাতিরা জঙ্গল হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ জঙ্গল তাদের কাছে জীবিকার বড়ো সংস্থান। সরকারি চাকরি সমস্তই বাঙালিরা দখল করে নিত। এছাড়া দেশভাগের আগে ও পরে এখানে বসবাসকারী বাঙালি মহাজনরা নানাভাবে কৌশলে অশিক্ষিত ভূমিপুত্রদের বাস্তুচ্যুত করত। ফলত বাঙালি তাদের কাছে

আতঙ্কের জীব হয়ে ওঠে। যা পরবর্তীকালে ব্যুমেরাং হয়ে বাঙালির দিকেই ফিরে আসে। বাঙালিরা এখন ভূমিপুত্রদের ভয় পায়। বাঙালির এই দুরবস্থার কথা ওই অঞ্চলের বাঙালি সাহিত্যিকদের কলমে স্থান পেয়েছে।

৩

এই সমস্যা শুধু বাঙালির নয়, বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও এরূপ যন্ত্রণার শিকার। প্যালেস্তাইনের আরবরা নিজদেশে পরবাসী হয়ে থাকে। তাদের দেশ থেকেও নেই। ইহুদীরা তাদের আজ সবকিছুই দখল করে নিয়েছে। যে ইহুদীদের কোনও রাষ্ট্র ছিল না, যারা সর্বত্রই অত্যাচারের শিকার হোত; তারাই আজ অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। প্যালেস্তাইনের আরবরা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার। এখনও ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ চলছে। কোনোদিন এই যুদ্ধের শেষ হবে কিনা কে জানে। আবার মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষরা স্থানীয় বৌদ্ধ ও পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে বোটে করে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে 'boat people'। তাদেরও কোনো দেশ নেই। মায়ানমার সরকার তাদেরকে বাংলাদেশি উদ্‌বাস্তু বলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে। একইরকমভাবে উঃ-পূঃ ভারতের বাঙালিদের অসমে নতুন করে NRCP-তে নাম তোলার যুক্তি কোথায়! আসলে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কিছু মানুষকে এই দেশ থেকে পুশব্যাক করা হবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। কিছু মানুষকে ডি-ভোটার ঘোষণা করা হবে। সবটাই রাজনীতির খেলা। যারা কয়েক প্রজন্ম ধরে এ দেশে বসবাস করছে, যারা এটাকে তাদের মাতৃভূমি হিসেবে জানে; তাদেরকেই একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে বলা হল তুমি বিদেশি। এই অবিচার মানা যায় না। গল্পকার মীনাক্ষী সেন এইসব বিষয়কে গল্পের আধারে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। লেখিকা যথার্থভাবেই তাঁর জোরালো কলম দিয়ে ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে বাঙালিদের সমস্যার কথা সঙ্কটের কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ ধরনের সমস্যা শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র উঃ-পূঃ ভারতের বাঙালিদেরই সমস্যা। তবে অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বর্তমানে ত্রিপুরায় বাঙালিদের অবস্থা ভালো। কিন্তু এখানেই তাদের অন্য ধরনের সংকটের শুরু। এই বাঙালিদের কারণেই ভূমিপুত্ররা আজ নানাভাবে বঞ্চিত; এই অপরাধ বোধ বাঙালিদের মনে আত্মিক সংকটের জন্ম দেয়। নিজের অস্তিত্বের কারণে অপরের অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন- এটাই ত্রিপুরার বাঙালিদের কাছে আজ আত্মিক সংকট। মীনাক্ষী সেনের গল্পের মধ্যে ত্রিপুরার বাঙালিদের কৃতকর্মের ফলই যে আজ তাদের ভোগ করতে হচ্ছে তা প্রমাণিত।

তথ্যসূত্র :

১. ত্রিপুরার 'রাজমালা' (১)
২. গুহ, রামচন্দ্র, 'গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ', অনু: আশীষ লাহিড়ী, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ (মূল ইংরেজি প্রথম প্রকাশ ২০০৭), পৃ. ২৩৮-২৩৯
৩. তদেব, পৃ. ২৪১
৪. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, 'অসমে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনঃ ছোটোগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ২১
৫. সেন, মীনাক্ষী, 'মীনাক্ষী সেন-এর ছোট গল্প', আগরতলা, সেতু প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ঢ
৬. সেন, মীনাক্ষী, 'দশটি গল্প', কলকাতা, পরশপাথর প্রকাশন, ১৪১৮, পৃ. ৭
৭. সেন, মীনাক্ষী, 'কয়েকটি মেয়েলি গল্প', আগরতলা, অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, ২০০৭, পৃ. ১১৭
৮. তদেব, পৃ. ৭০
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. গুহ, রামচন্দ্র, 'গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ', অনু: আশীষ লাহিড়ী, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ (মূল ইংরেজি প্রথম প্রকাশ ২০০৭), পৃ. ২৪৩

১১. সেন, মীনাক্ষী, 'মীনাক্ষী সেন-এর ছোট গল্প', আগরতলা, সেতু প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৬
১২. তদেব, পৃ. ৪
১৩. www.tripurainfo.com/info/ATripura/Militency1.htm
১৪. সেন, মীনাক্ষী, 'সাতকানি জমি', অশোক সেন(সম্পা), কলকাতা, বারোমাস, ষট্‌ত্রিংশতি বর্ষ সংখ্যা, ২০১৪, ডিসেম্বর, পৃ. ২৬০
১৫. তদেব, পৃ. ২৫৯
১৬. সেন, মীনাক্ষী, 'মীনাক্ষী সেন-এর ছোট গল্প', আগরতলা, সেতু প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১৬৬
১৭. সিংহ, দেবীপ্রসাদ, 'সীমান্তের ওপরে থমকে থাকা পা', গৌহাটি: নাইন্‌থ কলাম, ২০০৯, পৃ. ৩৯